আমার ভাই আবু সাঈদ

সুমি খাতুন*

কোটাসংস্কার আন্দোলনের একজন সাহসী যোদ্ধা ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক শহিদ আবু সাঈদ। তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। আবু সাঈদ একজন সাধারণ ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অদম্য স্পৃহা তাকে অসাধারণ করে তুলেছিল। তিনি কোটাসংস্কার আন্দোলনের একজন একজন গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়ক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে রংপুর অঞ্চলে আন্দোলন বেগবান হয়েছিল। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত হন আমার ভাই। তাঁর আত্মত্যাগ পরিবার ও পৃথিবীব্যাপী কোটি জনতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। আমি তার ছোট বোন, আমার সাথে শৈশবকাল থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত অনেক স্মৃতি রয়েছে। যা আমার হৃদয় মাঝে বিরাজ করে।

শৈশবকাল ছিল অনেক সুন্দর। আমরা ভাই, বোনের সবাই সবার থেকে দুই বছরের ছোট ছিলাম। আমরা কেউ কারো সাথে ঝগড়া করতাম না। আবু সাঈদ ভাইয়ার সঙ্গে খাবার নিয়ে আমি ঝামেলা করতাম। আবু সাঈদ ভাইয়া যেকোন খাবার যেটা বেশি ভালো সেটা আগে নিয়ে নিত যেমন: বাবা যেকোন ফলমূল বাজার থেকে আনলে বা মিষ্টিজাতীয় যেকোন জিনিস, সবার আগে যেটা ভালো তা হাতে নিত বা আমার থেকে বেশি নিত। আমি তখন কান্না করতাম। আমি কান্না করলেও ছোটবেলায় আমাকে কোনো জিনিস ফেরত দিত না, নিয়ে দৌড় দিত। আমি তখন আব্বা বাড়িতে আসুক, বলে দিব তুই বেশি খাইসিস। আর বড় হওয়ার পর তার উল্টোটা করে। ভালোটা আমার জন্য রাখে আর নিজে খারাপটা খায়। ছোট থেকে আবু সাঈদ ভাই সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছেলে হিসেবে পরিচিত। ছোট থেকে তার পরিবারের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। কম বয়স থেকে মা-বাবাকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করত।

আবু সাঈদ ভাইয়ার প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু হয় মায়ের হাত ধরে। আমাদের বাবা-মা কিন্তু লেখাপড়া বিষয়ে অজ্ঞ। তবুও আমাদের সবাইকে স্কুলে পাঠায় দিত। তো আবু ভাইয়া জীবনে প্রথম যেদিন স্কুলে যায়, সেদিন মা নিজে রাখি আসছিল। সেদিন থেকে আর কোনোদিন ভাইয়াকে স্কুলে যাইতে বলা বা রাখি আসা লাগেনি। ঐ স্কুলে একজন ম্যাডাম ছিল ওনার নাম মাহমুদা পারভীন, আবু সাঈদ ভাইয়ার ছোট বেলা লেখাপড়া শিখাতে যতটা অবদান ম্যাডামের আছে তার থেকেও কম অবদান আমার মা-বাবার আছে। ঐ ম্যাডাম আবু সাঈদ ভাইয়াকে এত ভালোবাসতো যে, তার লেখাপড়া করার জন্য খাতা কলম পর্যন্ত কিনে দিছে। তার শিক্ষাজীবনে সব স্যার ম্যাডাম অনেক ভালোবাসত। কিন্তু মাহমুদা পারভীন ম্যাডামের অবদান ছিল অন্যরকম। আমাকে একদিন বলছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ম্যাডামের জন্য কিছু গিফ্‌ট নিয়ে তার কাছে যাব। তার এতটা লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল যে, আমি কোনোদিন মা-বাবাকে বলতে শুনি নাই যে পড়তে বস। ভাইয়ার নিজের ইচ্ছায় নিয়মিত স্কুল যেতো এবং বাসায় পড়তো। আবার আমার কৃষিকাজ করায় মাঠে সাহায্যে করতো। এমন কোনোদিন হতো যে, মাঠ থেকে এসে স্কুলে যেত। এভাবে পড়তে পড়তে ভাই যখন ক্লাস ফাইভ এ বৃত্তি পরীক্ষা দেয়, তখন তার রেজাল্ট হয় গোল্ডেন A^+। টেলেন্টপুল বৃত্তি। তখন

---

* শহিদ আবু সাঈদের ছোট বোন, সেমিনার এটেনডেন্ট, বেরোবি, রংপুর

পরিবারের সবাই খুশি হয়। প্রতিবেশীরা বলে যে মা-বাবা লেখাপড়ার কিছুই জানে না, তার ছেলে দেখও কিরকম মেধাবী। তারপর শুরু হয় তাঁর মাধ্যমিক এর জীবন।

ভাইয়া মাধ্যমিক পড়েন খালাশপীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ওখানে যাওয়ার পর যাতায়াতের কষ্ট হওয়ার কারণে বাবার কাছ থেকে একটি সাইকেল আবদার করে নিয়েছিল। সেটা দিয়ে ভাইয়া হাইস্কুলে যাতায়াত করেছে। সেখানে গিয়ে তার অনেক কয়েকজন ভালা বন্ধু হয়েছিল। ওরা ভাইয়াকে খুব ভালোবাসতো। তারা ছিল অনেক বড় পরিবারের। তাদের মা-বাবা চাকুরি করত। কিন্তু তার বন্ধুরা বড় পরিবারের হলেও তাকে কোনোদিন ছোট করে দেখেনি। তাদের মন মানসিকতা অনেক ভালো ছিল। ভাইয়াও ভালো লেখাপড়ায়। পাড়ায় তাকে স্যার ম্যাডাম থেকে সবাই ভালো বাসতো। ভাইয়ার কয়েকজন বন্ধুর নাম- কনক, শিশির, ফরহাদ, রাসেল, খায়রুল, রিয়াজুল, মতিয়ার, মেহেদী, আজিজুল আর ও নাম না জানা অনেকে। এরা সবাই মাধ্যমিক এর বন্ধু। ভাইয়ার কঠোর পরিশ্রমের কারণে ক্লাস এইটে A^+ পায়। তখন থেকে আমাদের পরিবারের ভাইয়ার প্রতি আশা জন্মায় যে সে অনেক মেধাবী। ভালোভাবে লেখাপড়া করে অনেক ভালো কিছু হবে। ভাইয়া যখন এস.এস.সিতে গোল্ডেন A^+ পেয়েছিল তখন আমি দেখেছি কতটা পরিশ্রম করেছে। আমি প্রায় বাচ্চাদের মা-বাবাকে দেখি যে পরীক্ষার সময় ভালো খাবার নিয়ে রাখে। যাতে বাচ্চারা ভালোভাবে খাইতে পারে, কিন্তু ভাইয়ার জীবনে তা হয়নি। বাবা যা জোগাতে পারছে, তা দিয়েই খাইছে। কোনোদিন ভালো খাবারের জন্য আবদার করেনি। আর পরীক্ষার দিন খাবারের সময় পাইতনা। আর তার কঠোর পরিশ্রমের ফল হচ্ছে গোল্ডেন A^+। তখন তার প্রতি আমাদের পরিবারের আশাটা আরো বৃদ্ধি পায়। বাবাতো খুশিতে সবার কাছে ভাইয়ার কথা বলত। আর আমি দেখেছি তার কতটা আনন্দের জল আসত।

ভাইয়া ছোটবেলায় কুরআন পড়া শিখেছেন। ছোট থেকে নামাজ কালাম পড়ে। এমনকি আমি আমার বোজার বয়সে ভাইয়াকে রমজান মাসে একটি রোজাও কাজা করতে দেখিনি। আমার মনে পড়ে একবার রমজান মাসে ধানের কাজ শুরু হওয়ার কারণে ভাইয়ার রোজা থাকতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। তার পরেও ভাইয়ার রোজা ভঙ্গ করেনি। ভাইয়া পবিত্র মক্কা শরিফে যেভাবে নামাজ পড়ে ঠিক সেইভাবেই নামাজ আদায় করত। আমার জানা মতে ভাইয়া আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ এর ওয়াজ শুনত। বড় ভাইদেরও আগে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা) এর সুন্নত দাড়ি রেখেছিলেন। তিনি মেসে সিদরাতুল মুত্তাকিমনামে বই পড়ত। ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও ঈমান ছিল তার।

প্রাইমারি লেখাপড়া শেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে টিউশনি শুরু করেন ভাইয়া। এই টিউশনির টাকা দিয়ে ভাইয়া নিজের লেখাপড়ার খরচ চালায়। লেখাপড়া খরচের পাশাপাশি ভাইয়া নিজের বন্ধুদের মেশার জন্য নিজের গায়ের জামাও ক্রয় করে। বাবার বয়স হওয়ার কারণে তার কাছ থেকে সেরকম কোনকিছু চাইত না। আমি দেখেছি অনেক ছেলে-মেয়ে তাদের বাবার কাছ থেকে ২০-২৫ হাজার টাকা ফোন আবদার করে। কিন্তু ভাইয়া পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো শার্ট, প্যান্ট আবদার করতে পারেনি। সে তার স্টুডেন্ট জীবন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে পরিবারের লোকদের মুখে একঝলক ফোটানার অনেক চেষ্টা ছিল তার। কিন্তু আল্লাহ পাকের কী ইচ্ছা একটি যৌক্তিক দাবি তার এবং পরিবারের সকল স্বপ্ন একনিমেষেই শেষ হয়ে যায়।

কলেজ জীবনে লেখাপড়া করেন রংপুর সরকারী কলেজে। সেখানে লেখাপড়া করার সময় ভাইয়া শুধু বাড়ি থেকে চাল নিয়ে এসেছিল। কলেজের লেখাপড়াটাও ভাইয়া টিউশনি করে চালাইছে। তার মধ্যে এস.এস.সি গোল্ডেন A^+ পাওয়ায় ঢাকা ব্যবিলন গ্রুপ থেকে একটা লিখিত পরীক্ষার সুযোগ পায়। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রতি মাসে ভাইয়া টাকা পাইত যা দিয়ে ভাইয়া অনেক উপকৃত হইছে। ওই সময় কলেজ থেকে ভাইয়া একটা স্কলারশীপ পেয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করাটা একান্ত তার ব্যক্তিগত চেষ্টার মধ্যে দিয়ে হয়েছে। কেননা আমার মা-বাবা বিশ্ববিদ্যালয় কী তাই জানত না। আর তাকে পড়তে বলবে কী। ভাইয়া কোনো কোচিং বা টিউশনি ছাড়াই নিজের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়। এখানে ভাইয়া বাচ্চাদের বাসায় পড়াত এবং কোচিং এর ক্লাস নিত। এত কষ্ট করে লেখাপড়ার করার কারণে ভাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসেও একটা নতুন টাচফোন কিনতে পারেনি। এত কষ্ট করে লেখাপড়া করার পরেও আবার টিউশনির টাকা বাড়িতে দিয়ে সাহায্য করত। তিনি ছিলেন সংগ্রামী জীবনের অন্যতম নায়ক।

নিজের খরচ চলার পাশাপাশি বিভিন্নভাবে পরিবারকে সাহায্য করেছিল যেমন: আমি যখন জাফর পাড়া কামিল মাদ্রাসায় দশম শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার লেখাপড়ার খরচ বেড়ে যায়, বাবার কাছে চাইতে সংকোচ করতাম। তখন ভাইয়া ইন্টারে পড়ত তখনই ভাইয়া আমার লেখাপড়ার জন্য যা কিছু লাগে জাফর পাড়া বাজারে রিজার্ভ করে দিয়েছিল। আমাকে আরো অনেকভাবে সাহায্যে করেছিল। মা যদি অসুস্থ হইতো রংপুর থেকে ছুটে গিয়ে মাকে ডাক্তার এর কাছে নিয়ে যেত। নিজের টিউশনির টাকা দিয়ে মাকে ঔষধ কিনে দিত। রমজান মাসে মা-বাবাকে ভালোমন্দ খাওয়ার জন্য টাকা দিতো। আর তার ভাগ্না-ভাগ্নির প্রতি ছিলো অগাধ ভালোবাসা। খাবার জিনিস বাদ দিয়েও তাদের জন্য নতুন গায়ের জামা কিনত। যে মানুষটা টিউশনির টাকায় এত কিছু করতে পারে, আবার বাড়িতে আসলে মা-বোনকে জিজ্ঞেস করতো কিছু খাবে নাকি। তাহলে সে লেখাপড়া শেষে বড় কোন জায়গায় দাঁড়ালে কি করতো।

ভাইয়া ছোটবেলা থেকে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করার কারণে আমার ভাইয়ের প্রতি অনেক আশাবাদী ছিলাম। আমরা ভাবছিলাম জীবনে অনেক বড় কিছু একটা হবেই যেমন: শিক্ষা ক্যাডার, বিসিএস ক্যাডার বা বড় কোনো অফিসার আমাদের পরিবারের কেউ এতদূর পর্যন্ত লেখাপড়া করে আসতে পারেনি। কঠোর পরিশ্রম ও মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ভাইয়া এই জায়গায় পৌঁছেছিল। ভাইয়ার বন্ধুরা যখন ভাইয়াকে তাদের বাবার মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে নিয়ে যেত তখন আমি ভাবতাম ভাইয়ারও একদিন এইরকম গাড়ি হবে। আমরা গরিব বলে অনেক জায়গায় অবহেলিত হইছি। কিন্তু মহান আল্লাহ আবু সাঈদ ভাইয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক আগে থেকে আমাদের পরিবারকে সম্মানিত করেছিল। আমার বাবা মারা যাওয়ার আগে একটা ইচ্ছার কথা বলেছিল। সেটা হচ্ছে তার মৃত্যুর আগে যেন আবু সাঈদ ভাইয়ার একটা চাকুরি হইছে সেটা দেখতে পায়। তাহলে তার আত্মা শান্তি পাবে। তাহলে কতটা কষ্ট লাগবে যদি সেই সন্তানই তার সামনে লাশ হয়।

মেস থেকে বেশি বাড়িতে আসত না ভাইয়া। তার কারণ হচ্ছে টিউশনি করাত। প্রয়োজন পড়লে বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা আসত। আবার শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা চলে যেত। ধানের কাজের সময় এক/দুই দিন এসে থেকে বাবাকে কাজে সাহায্যে করত। এছাড়া ঈদে বাড়িতে এসে কয়েকদিন থাকত। ঈদে বাড়িতে আসলে ভাইয়া তাঁর হাইস্কুলের বন্ধুদের সাথে সময় কাটাত। বাড়িতে আসলে মাকে তেমন কোনো রান্না করতে বলতো না, যা জুটত তা দিয়েই ভাত খেয়ে চলে যেত।

সবজির মধ্যে সব সবজি ভাইয়া পছন্দ করত। ছোটবেলায় ভাইয়া ইচ্ছা করে মিষ্টি কুমড়া আর বেগুন খাইত না। মাছ-মাংস বেশি পছন্দ করত। ভাইয়ার বেশি পছন্দের খাবার ফল-মূল। আম-কাঁঠাল বেশি পছন্দ করত। পিঠা পায়েস পছন্দ করত। কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে কখনও পিঠা তৈরী করতে বলত না।

ভাইয়া কেন আমাদের গোষ্ঠীর কেউ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিল না। আমার ছোট থেকে দেখে আসতেছি, আমরা বাবা কোন দলাদলি করতেন না।

আর, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা যে আমার ভাইয়া নিজের দলের লোকের হাতেই মারা গেছে বা ছাত্রশিবির করত। অতএব আমাদের পরিবার থেকে দাবি হচ্ছে ভাইয়াকে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়াবেন না।

ভাইয়া কুরবানি ঈদের দুদিন আগে বাড়িতে এসছিল। বাড়িতে আসার পর ফোন করে ভাইয়া আমাকে ঈদের দাওয়াত দেয়। ঈদের দিন কুরবানি শেষে খাওয়াদাওয়া করার পর আমার বাড়িতে আসে। এসে আমার মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে দোকানে চলে যায় মজা কিনে দেওয়ার জন্য। দোকান থেকে বাড়িতে এসে আমার সাথে ভালোমন্দ কথা বলার পর আমি খাইতে বললে বলে যে আমি মমতা আপার বাড়িতে খাইছি। তখন আমি কিছু আম খাইতে দেই। ভাইয়া কিন্তু আম খুব পছন্দ করত। তারপর বাড়িতে আসার সময় বলে তুই কিন্তু কাল সকালে আসিস। ঈদের পরের দিন ভাইয়া তার হাইস্কুলের বন্ধু কনক ভাইয়ার বিয়ে খাইতে যায়। পরে সেই জায়গা থেকে আসে রাত ১০.০০টার দিকে। পরে ভাই-বোন মিলে অনেক কথা বলাবলি ও হাসাহাসি করি। পরের দিন সকালে আমাদের কিছু ধান সিদ্ধ করা ছিল যেগুলো আমি ও ভাইয়া আমাদের পাশের বাড়ির আঙিনায় নেড়ে দেই। তখন বৃষ্টি হওয়ার কারণে ধানগুলো নষ্টের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। তখন ভাইয়া মাকে বলেছিল ধান সিদ্ধ করলে আমার কাছে ফোন দিবে। কারণ হচ্ছে এখন আবহাওয়ার খবর জানা যায় আজ থেকেই কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হবে।

কুরবানি ঈদের দুই দিন পরে আমি আর ভাইয়া আমার মেয়েকে ডাক্তার দেখানোর জন্য পীরগঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার দেখানোর পর ভাইয়া আমাকে বলল তুই কখনো পীরগঞ্জ সুইজগেট গেছিলি। আমি বললাম না। তখন ভাইয়া বলল চল ঘুরে নিয়ে আসি। আর বলল যে মাঝে মাঝে ঘুরতে বের হতে হয়। তাহলে মন ভালো থাকে। তখন আমি ভাইয়ার কাছে রংপুর চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়ার আবদার করলাম, তখন ভাইয়া বলল ঠিক আছে তোকে একদিন সময় করে নিয়ে যাব।

সেদিন সকাল বেলা মা ধান সিদ্ধ করেছিল। আমরা দুই ভাইবোন সেগুলো বস্তা করে অন্য বাড়িতে রোদে দেই। সেদিন যে ভাইয়া সকাল বেলা কী সবজি দিয়ে ভাত খাইছিল তা আমার খেয়াল নাই। কিন্তু দুপুর বেলা মিষ্টি কুমড়া ও গরুর হাড্ডি দিয়ে রান্না করেছিলাম, আমি তা দিয়ে দুপুরের খাবার খাই। এবং দুপুর ২.৩০ দিকে আব্বা-মাকে বলে আমার হাতে দুইশত টাকা দিয়ে রংপুর চলে আসে। আমি টাকাটা দেওয়ার সময় বলেছিলাম না লাগবে না। তোমার চলার মতো টাকা আছে, তখন বলে আছে। তুই এটা নে। এতকিছুর মাঝে এই দুইশত টাকা আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

আমি গর্বিত, আমি তার ছোট বোন। ভাই হিসেবে তিনি ছিলেন অনেক স্নেহশীল, আমাকে রাখতে চেয়েছিল পরমযত্নে। সে আমাদের জাতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। কত সাধারণ থেকেও ব্যক্তিত্ব ছিল সবার সেরা। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অনেক বেশি। আজকে যে সম্মান

তিনি তার পরিবারের জন্য রেখে গেছেন, তা শুধু আজকের নয়, তার শিক্ষাজীবন শুরু থেকে একটু একটু করে বয়ে এনেছে। তিনি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী প্রকাশ পাওয়ায় তার পরিবারকে অনেক আগে থেকে অনেক প্রভাবশালী লোক সম্মান দিত। এই সম্মান আজ বহুগুণে বেড়ে গেছে। মেধার যুদ্ধে বৈষম্য আর অনিয়মের বিরুদ্ধে নিজের বুক টান করে দাঁড়ায় হায়ানাদের সামনে। সেই হিংস্র হায়েনারা শেষ পর্যন্ত গুলি চালায় তার বুকে। তিনি তার মূল্যবান জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন অন্যায়ের সামনে মাথা নত করা জাতি আমরা নই। এই মহান ব্যক্তির মূল্যবান জীবন ত্যাগ আমরা যেন কখনো না ভুলি। তাই তার আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে প্রতিবছর ১৬ জুলাই শহিদ আবু সাঈদ দিবস হিসেবে পালন করব। এই দিনটি যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে যেকোন সরকার থাকাকালীন পালন করা হয়। মহান আল্লাহ যেন আমার ভাইকে শহিদ হিসেবে কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন, আমিন।